<u>চাল রপ্তানী করে দেশ বছরে</u>
<u>এক লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা আয় করতে পারে</u>

--------------------------------ড. সেলিম রশিদ

বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, চাহিদা অনুযায়ী ধান উৎপাদনে সক্ষম একটি দেশ। কিন্তু, আমরা আরও ২০ মিলিয়ন মেট্রিক টন অতিরিক্ত চাল উৎপাদন করতে পারি। যদি অতিরিক্ত এই চাল বিশ্ববাজারে আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রতি কেজি ৬০ টাকা দরে বিক্রি করি, তাহলে আমাদের কৃষকরা বছরে এক লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা আয় করতে পারে। তাহলে বাঁধা কোথায়? দেশের কৃষকরা অতিরিক্ত এই চাল উৎপাদনে আগ্রহী হবেন যদি বিশ্ববাজার অনুযায়ী তারা এই ন্যায্য দাম পান। যেহেতু এটি অতিরিক্ত চাল, সেহেতু, এতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় কোন সংকট হবেনা। চাহিদা অনুযায়ী চাল মজুদ থাকবে। প্রখ্যাত কৃষিবিদ ড. জেড করিম বলছেন, বাংলাদেশ বছরে ২৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন বাড়তি চাল উৎপাদন করতে পারে। বাড়তি চাল উৎপাদন ও রপ্তানীর সঙ্গে মানুষের আয়ের পরিধিও বেড়ে যাবে। আর তখনই কৃষকের স্বার্থে চালের দাম বাড়িয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে।

অতিরিক্ত চাল উৎপাদনের জন্য সরকারি অনুমতির প্রয়োজন। চাল বাজারজাতকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে মজুদের সঙ্গে অনেক ব্যয় সংশিষ্ট, যেমন: মান অনুযায়ী ধান পৃথক্‌করণ, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, কৃষি সম্প্রসারণ সেবা ব্যয় ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো পাত্রে কয়েক বিন্দু জলমাত্র।

এছাড়া ধান উৎপাদন এবং এর বিপণন ব্যবস্থাপনা-সংশিষ্ট ব্যয় যেহেতু পুরোপুরিই অভ্যন্তরীণ বিষয়, আমাদের বেকার যুবকরা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হিসেবে নতুন চাকুরী পাবে। ধান প্রক্রিয়াকরণ এবং এর পরিবহনেও অনেক কর্মসংস্থান হবে। শুধুমাত্র ট্রাক ব্যবহারের কথাই চিন্তা করি। ২০ মিলিয়ন টন চাল পরিবহনের জন্য ১০টন ধারণক্ষম কতগুলো ট্রাকের প্রয়োজন হবে? অবশ্যই আমাদের বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থার যতটুকু ক্ষমতা আছে তার চেয়ে বেশি। সুতরাং এক্ষেত্রে পরিবহন ব্যয় এবং পরিবহনের সুবিধার্থে নৌ-পথের ব্যবহার অনেকগুণ বাড়বে। এই বিষয়টি কি তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা সৃষ্টি করবে না যা আমাদের অর্থনীতিবিদগণ আলোচনা করতে পারেন? শুধুমাত্র ধান উৎপাদনে পানির সংকট হতে পারে। আউশ, আমন এবং বোরো ধানের উৎপাদন সমপর্যায়ে নিয়ে আসতে হলে অনেক পানির প্রয়োজন। বোরো উৎপাদনে আমাদের রিজার্ভ পানি বেশি ব্যয় হবে।

বিতর্কের ক্ষেত্রে নতুন ধ্যান-ধারণা প্রধান বিষয় নয়, মূল বিষয় হচ্ছে যৌক্তিকতা। ১৯৭০ এর দিকে এরকম চিন্তা অনেকেই করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সময়ে এবিষয়ে একটি ভালো নীতি কেন প্রণীত হলো না? এদেশের উর্বর ভূমি হচ্ছে আল্‌লাহ্‌র দান। যতদিন ভারত পানি-প্রবাহ বন্ধ না করবে ততদিন প্রকৃতির এই দান প্রবহমান থাকবে। প্রকৃতির এই আশির্বাদ প্রতিযোগিতার বাজারে হারাবার নয়। এটি গার্মেন্টস্ শিল্পের মতো নয় যে, স্বল্প মজুরীর ভিন্ দেশে ধাবিত হবে।

আমরা কিভাবে জানবো যে উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বাড়বে না? ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু বিদেশে রপ্তানীর জন্য উদ্বৃত্ত চাল সহজলভ্য হবে--এই প্রত্যাশার বিবিধ কারণে রয়েছে। প্রথমত, যেহেতু আয় বৃদ্ধি পেলে চালের চাহিদা কমে, ধনীরা তাদের বাড়তি আয়ের সামান্যই চাল কেনার জন্য ব্যয় করে; দ্বিতীয়ত, নগরায়ন ক্রমশই বাড়ছে এবং নগর-শহরাঞ্চলের মানুষের গ্রামের চাইতে কম চাল লাগে; তৃতীয়ত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্থিতিশীলভাবে হ্রাস পাচ্ছে। সুতরাং পরবর্তী দশকই হবে আগামী ৪০ বছরের সর্বোচ্চ চালের চাহিদার দশক। চতুর্থ কারণটি বাস্তব সম্মত, কিন্তু এর প্রকৃত প্রভাব কি হবে তা নির্ণয় করা যায়নি। গর্ভবতী মায়ের খাবারের সংকট হলে গর্ভের সন্তানের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার বেশি খাদ্যের দরকার হবে। এটি আরও সত্যি সেই সকল শিশুদের ক্ষেত্রে যারা ক্ষুধার ভেতর দিয়ে বড় হয়েছে। চালের ক্রমবর্ধমান সহজলভ্যতা এবং সম্পদ ও সামাজিক সেবার ব্যাপ্তির মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়। মাতৃগর্ভে কিংবা শৈশবে খাদ্যকষ্টের শিকার লোকের সংখ্যা কমবে এবং সার্বিকভাবে অন্নকষ্টের শিকার লোকের সংখ্যা একেবারে কমে যাবে। ধান উৎপাদনের অনেক সম্ভাবনার পটভূমিতে এখন আমাদের উচিত হবে উদ্বৃত্ত ধান নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া, ঘাটতি নিয়ে নয়।

তাহলে আমরা কেন প্রকৃতির এই দানকে কাজে লাগাচ্ছি না? যেহেতু ধান উৎপাদন কোন সমস্যা নয়, তাহলে এর বিতরন নিয়ে আলোচনা করা যাক। মানুষ কোথা থেকে চাল কেনার টাকা পাবে? বর্তমানে হত–দরিদ্র মানুষের জন্য যে খাদ্য–সাহায্য কর্মসূচি রয়েছে তা চালিয়ে যেতে হবে এবং এর সাথে স্বচ্ছলদের কথাও বিবেচনা করতে হবে। গ্রামীন ও শহুরে, গরীব ও ধনী ––উপার্জনের নিরিখে এই ৪টি গ্রুপের মানুষের কথা ভাবা যাক। গ্রামীন জনগনের সমস্যার কথা বিবেচনায় নিতে হবে। গ্রামীন ধনীরা আরো ধনী হবে যদি চাল রপ্তানীর অনুমতি পাওয়া যায়। জমির মূল্য বেড়ে যাবে। জমি ক্রয়–বিক্রয়ের কর আদায় বাড়বে যা দিয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য খরচেরও যোগান হবে। গ্রামের মানুষের আয়বৃদ্ধির সাথে সাথে সবসময়ই গ্রামীন মজুরী বেড়েছে। এর যে বাস্তব প্রভাব পড়বে তা হচ্ছে––বিদ্যমান আঞ্চলিক বৈষম্য কমবে, মফস্বল শহরগুলোর উন্নয়ন ঘটবে এবং ঢাকামুখী জনস্রোত মিইয়ে আসবে।

শহরের সমস্যা কিছুটা জটিল। শহরাঞ্চলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বিদ্যমান মজুরী বাড়বে। নগর দরিদ্রদের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন স্বল্পমেয়াদী খাদ্য সাহায্য দেওয়া সঙ্গত। শহরের বিত্তশালীরা খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাবের বাইরে থাকে। শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণির দিকে একটু নজর দিতে হবে, যেহেতু তাঁদের উপার্জন নির্দিষ্ট। এর আগে যে বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে দেখা উচিত তা হল: গ্রামের মানুষের অল্পসংখ্যায় শহরে অভিবাসন, করের উৎসের বহুমাত্রিকীকরন এবং মফস্বল শহরগুলোর উন্নয়নের দ্বারা শহর–নগরের সকল শ্রেণিই লাভবান হবে।

এখন শহরের নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যবিত্ত মানুষের কথা ভাবা যাক্। শহরে এই মধ্যবিত্তদের আমরা দুই শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি: এক ভাগ হচ্ছে যাদের গ্রামের সাথে অর্থনৈতিক আয়ের সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ গ্রামে জমি–জমা আছে এবং আরেক অংশ যাদের গ্রামের সাথে আয়ের সম্পর্ক নেই।

গ্রামীন আয়ের সাথে সম্পর্কিত লোকেরা শহরে চালের উচ্চমূল্যের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু গ্রামে জমির মূল্যবৃদ্ধির ফলে এবং অন্যান্যভাবে লাভবান হবে। কারন জমির সাথে তাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। অনেকে বলেন, গ্রামে আমাদের জমি আছে কিন্তু আমরা কখনই সেখান থেকে কোনো টাকা–পয়সা আনি না। আচ্ছা, কেউ যদি খুব ধনী হন তাহলে তো তার টাকা আনার দরকার নেই, ভালো কথা। কিন্তু যদি ঐ জমি থেকে আয় ১০ গুন বেড়ে যায়, তখন হয়ত তিনি এ বিষয়ে সচেতন হবেন। গ্রামের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কযুক্ত লোকেদের উপর চাল রপ্তানীর সিদ্ধান্তের কোন প্রভাব পড়বে না।

চাল রপ্তানীর সিদ্ধান্তের কারনে তারা হয়ত সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, যাদের গ্রামের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা নেই। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা দেশের শিক্ষা এবং মানব সম্পদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী। এরা যে কোন মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিস্থিতিতে খাপ–খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা রাখে। আমার ধারনা এদের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫ ভাগ, অথবা সংখ্যায় ১ কোটি। এই ৫ ভাগ লোকের দাবীর মুখে চাল রপ্তানীর সিদ্ধান্ত, যা কি–না ১৫ কোটি লোকের জন্য লাভজনক হবে, তা কি উপেক্ষা করা হবে? অগ্রাহ্য করা হবে এক লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনাকে?

ড. মোমিন রশিদ, সভাপতি, কম্প্যাক্ট টাউনশীপ ফাউন্ডেশন; ভিজিটিং প্রফেসর, সাউথ প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়;
ইমেরিটাস অধ্যাপক, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র।